হাকীম হাবীবুর রহমান-এর জীবনী
এবং উর্দু সাহিত্যে তাঁর অনবদ্য অবদান

জাফর আহমদ ভূঁইয়া*

Abstract: Hakim Habibur Rahman (1881-1947), a distinguished Urdu literary journalist of the Bengali literary society, renowned politician and famous Unani physician who had been honoured with the title of 'Shefaul Mulk' given by the British government and 'Magician of Bangla' given by Syed Sulaiman Nadvi, is one of the best intellectuals of Bengal in the first half of the 20th century. This short-lived personality was born in Chotakatra, Dhaka. After that, He studied in Dhaka, Kanpur, Lucknow, Delhi, Agra and gained expertise in Unani medicine and returned to Dhaka. He contributed in various fields in his varied career. He had outstanding contributions to the Muslim Renaissance movement of Bangladesh and Sir Salimullah's political and educational movement. He was one of the founders of Dhaka University (1921) and Dhaka Museum (now know as National Museum of Bangladesh). He played a significant role in spreading Urdu language and literature in Dhaka. He is called the pioneer of Urdu journalism in East Bengal and Asam. During that period, he established a big library by collecting Urdu, Persian and Arabic books written on Bengal and through this effort he tried to preserve the Bengali old history and tradition. In short, as a bearer of Muslim nationalism and a great teacher and physician, Hakim Habibur Rahman was a successful poet and essayist, translator, literary compiler, dramatist, biographer, historian, politician, organiser and a journalist.

জন্ম ও বংশ পরিচয়

স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব এবং বহুমাত্রিক গুণের অধিকারী হাকীম হাবীবুর রহমান এর পূর্বপুরুষ ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) এর বংশধর ছিলেন। তারা আরব থেকে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পেশোয়ার জেলার তুতালী নামক জায়গায় আগমন করেন। (আব্দুল্লাহ, ১৯৫৪ : ১) কিছুকাল পরে এদের পূর্বপুরুষ হাজী সালেকসহ অন্যান্যরা এ স্থান ত্যাগ করে ইয়াগিস্তানের চাংলাই নামক জায়গায় বসবাস শুরু করেন। এখানেই হাকীম হাবীবুর রহমানের পিতা মাওলানা মুহাম্মদ শাহ আখুনযাদা বেড়ে ওঠা। তিনি (হাকীম সাহেবের পিতা) দারুল উলুম দেওবন্দ এ অধ্যায়ন কালে মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর (রহ.) এর সহপাঠী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। সেখানে পড়ালেখা শেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জীবিকার উদ্দেশ্যে ঢাকায় আগমন করেন। (আযীম, ১৯৮১ : ১১১) এখানে ঢাকার নবাব স্যার আহসানুল্লাহ (১৮৪৫-১৯০১) এর অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন।[৪] চাকরি গ্রহণের কিছুকাল পরে তিনি তৎকালীন ঢাকায় বসবাসরত সৈয়দ হাসান আলীর সুযোগ্য তনয়া হালিমুন নেছাকে বিয়ে করেন। এবং তাঁদের দাম্পত্য জীবনে মহান প্রভুর অনুগ্রহ স্বরূপ দুইটি সুযোগ্য সন্তান জন্মলাভ করে। তাঁরা হলেন যথাক্রমে কাজী আযীযুর রহমান (মৃত্যু : ১৭ মে ১৯৭২) এবং হাকীম হাবীবুর রহমান (মৃত্যু: ২৩ ফেব্রু. ১৯৪৭)।

হাকীম সাহেবের প্রকৃত নাম হাবীবুর রহমান খান আখুনযাদা। তবে তার সম্পূর্ণ নাম শেফাউল মূলক মাওলানা হাকীম হাবীবুর রহমান খান আখুনযাদা। এখানে "শেফাউল মূলক" শব্দটি ১৯৩৯ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত একটি সম্মানসূচক খেতাব, "মাওলানা" শব্দটি একটি ধর্মীয় উপাধি এবং

* অধ্যাপক, উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

"হাকীম" শব্দটি ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রের ডিগ্রি স্বরূপ। তিনি ২৩ মার্চ ১৮৮১ সালে ঢাকার ছোট কাটরায় জন্মগ্রহণ করেন। (সিরাজুল, ২০০৩, সম্পাদিত) তবে তাঁর জন্মসন নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। "মাশরিকী বাঙ্গাল মেঁ উর্দু" এর লেখক ইকবাল আযীম, (আযীম, ১৯৫৪ : ১১১) "পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু" এর লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (মুহিউদ্দিন, ১৯৬৯ : ৫৪) এবং "সালাসা গাসসালাহ" এর সম্পাদক আরিফ নওশাহী (নওশাহী, ১৯৯৫ : ১৫) এর বক্তব্য অনুযায়ী হাকীম হাবীবুর রহমান এর জন্মসন ১৮৮০ বলে জানা যায়। তবে অন্যদিকে ড. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলাপিডিয়া, ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ এর "হাকীম হাবীবুর রহমান" (আব্দুল্লাহ, ১৯৮১ : ২) ও ওয়াফা রাশেদী এর "বেঙ্গল মেঁ উর্দু" (ইস্রাফিল, ২০১৬ : ১৬-১৭) ইত্যাদি গ্রন্থে হাকীম হাবীবুর রহমানের জন্মসন ১৮৮১ উল্লেখ করা হয়েছে। এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত গবেষণা এবং নানান তথ্য উপাত্ত-বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষার পর, বাংলাপিডিয়া, তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজ এর মুখপত্র "আল হাকিম" এবং জনাব হাবীবুর রহমানের দুই পুত্র জনাব ইজতিবাউর রহমান খান এবং জনাব ইসতিফাউর রহমান খানের দেওয়া তথ্য থেকে আমাদের কাছে এটাই সত্য প্রতীয়মান হয় যে, হাকীম সাহেব ১৮৮১ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন

হাকীম হাবীবুর রহমানের পূর্বপুরুষগণ শিক্ষিত ছিলেন। তাঁর পিতা মুহাম্মদ শাহ আখুনযাদা নিজেও একজন আলেমে দ্বীন এবং পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি "দারুল উলুম দেওবন্দ" এ অধ্যায়ন করেছেন। সেখানে তিনি হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর (রহ.) এর সহপাঠী ছিলেন। হাকীম হাবীবুর রহমানের পড়ালেখার শুরু হয়েছে তাঁর বিদ্বান ও ধার্মিক পিতা-মাতার কাছে। এরপর প্রথমত তিনি "ঢাকা মাদ্রাসা" থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এ সময় পড়ালেখার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ দেখে তার শিক্ষকরা তাকে উচ্চ শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করে। ফলে তিনি ১৮৯৪ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে ঢাকা থেকে ভারতের উত্তর প্রদেশের কানপুরে চলে যান এবং সেখানে "দারুল উলুম কানপুর" মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর নিকট আরবি ব্যাকরণ, শামসুল উলামা মাওলানা ইসহাক বর্ধমানীর নিকট ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান, মাওলানা আহমদ হাসান ও আব্দুল ওয়াহহাব বিহারীর নিকট যুক্তিবিদ্যা, মুফতি লুৎফুল্লাহ আলীগড়ী এবং মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর এক ছাত্রের নিকট ইলমে হাদিস বিষয়ে অধ্যয়ন করে এই বিষয়গুলোতে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। (ইস্রাফিল, ২০১৬ : ১৯) এ সময় তিনি ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন। এ কারণে ১৮৯৭ সালে তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপ্ত করে "লখনৌ তিব্বিয়া কলেজ" এ ভর্তি হন। কিন্তু এখানে নিজের চাহিদা মোতাবেক জ্ঞান অর্জন করতে না পারায় তিনি দিল্লির বিখ্যাত চিকিৎসা কেন্দ্র "জামেয়া মিল্লিয়া তিব্বিয়া" তে ভর্তি হন। এখানে তিনি "হাযেকুল মূলক" খ্যাত বিখ্যাত ইউনানী চিকিৎসক আব্দুল মজীদ খানের নিকট ইউনানী চিকিৎসা শিক্ষার্জন করেন। অতঃপর ১৮৯৯ সালে আগ্রায় যান এবং বিখ্যাত হাকীম আগা হাসানের তত্ত্বাবধায়নে ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রে দক্ষতা লাভ করেন। (আব্দুল্লাহ, ১৯৯১ : ১১৬) অবশেষে তিনি দীর্ঘ ১১ বছর কানপুর, লখনৌ, দিল্লি এবং আগ্রায় আরবি, যুক্তিবিদ্যা, ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণ ও চিকিৎসা বিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে ১৯০৪ সালে তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। (হাকিম, ২০০১ : ২৫)

কর্মজীবন

হাকীম হাবীবুর রহমানের কর্মজীবনের শুরু হয়েছে চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে তিনি একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ এবং বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিক হিসেবে দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরু দায়িত্ব

পালন করেন। এরই মাঝে তিনি সাহিত্য সাধনা চালিয়ে যান। নানান কর্মব্যস্ততার মাঝেও তিনি বাংলা এবং উর্দু সাহিত্যের জন্য সমানভাবে কাজ করে গেছেন। জীবনের শেষ ভাগে তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার হিসেবে কাজ করেছেন।

১৯০৪ সালে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আনুষ্ঠানিক পড়ালেখা শেষ করে তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন এবং চিকিৎসা সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। খুব অল্প দিনের মধ্যেই একজন দক্ষ এবং সফল ইউনানী চিকিৎসক হিসেবে তার সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে খুব সহজে এবং অতি সত্বর তিনি তৎকালীন ঢাকার নামকরা সব বড় বড় জমিদার পরিবারের চিকিৎসক হয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি এ সময় চিকিৎসা বিদ্যায় তার সুনাম-সুখ্যাতি এবং পারদর্শিতা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫) তাকে কাছে টেনে নেন এবং তার "ব্যক্তিগত চিকিৎসক" পদে নিযুক্ত করেন। (আব্দুল্লাহ, ১৯৯১ : ১১৬) জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

নবাব স্যার সলিমুল্লাহ এর সংস্পর্শে এসে হাকীম সাহেব রাজনীতি ও শিক্ষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯০৬ সালে ১৪ এবং ১৫ ই এপ্রিলে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের শিক্ষা সমিতি ১ম অধিবেশনে নবাব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা (১৮৬৩-১৯২২) মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিলে হাকীম হাবীবুর রহমানসহ অন্যান্যরা এই প্রস্তাবের জোরালো সমর্থন জানিয়েছিলেন। এছাড়াও এ সময় তিনি সাংবাদিকতা সাথেও জড়িয়ে পড়েন। ১৯০৬ সালে তিনি "আল মাশরিক" নামক একটি উর্দু মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। যা ১৯০৮ সাল পর্যন্ত চালু ছিল।তিনি ছিলেন এই পত্রিকার একমাত্র সম্পাদক। এই পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে তিনি পূর্ববঙ্গ ও আসাম থেকে উর্দু সাংবাদিকতার সূচনা করেন। (আব্দুল্লাহ, ১৯৯৬) এরই মাঝে ১৯০৮ সালে তিনি ঢাকার রহমতগঞ্জ এর বাসিন্দা বালুহাজীর ধার্মিক তনয়া আমিরুন নেসা খাতুনকে বিবাহ করেন এবং দাম্পত্য জীবনের শুভ সূচনা করেন। এছাড়া এ বছরেই তিনি রাজনীতির সাথে সরাসরি ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯০৮ সালের জুন মাসে যখন "পূর্ববঙ্গ ও আসাম মুসলিম লীগ" গঠিত হয় তখন হাকীম হাবীবুর রহমান এর যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। (হাকিম, ২০০১ : ৪৪)

রাজনীতি, শিক্ষা সংস্কার এবং দাম্পত্য জীবনের পাশাপাশি যখন তিনি সুনাম ও সাফল্যের সাথে চিকিৎসা সেবায় কাজ করে যাচ্ছিলেন এমতাবস্থায় ১৯০৯/১৯১০ সালে হায়দ্রাবাদের নিজাম সাহেব তাঁকে মাসে ১০ হাজার টাকা বেতনে চাকরি দিতে চেয়েছিল কিন্তু তিনি তা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করেন এবং দেশে থেকেই মানবতার সেবায় ও জনগনের কল্যাণে কাজ করেন। (মুসতাসির, ১৯৯৩ : ১০৬) ১৯১২ সালে দেশের পুরানো ইতিহাস ও ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখার স্বার্থে, যখন এ দেশে একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল, ঠিক তখন সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র, খাজা মোহাম্মদ ইউসুফ, হাকীম হাবীবুর রহমানসহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্যোগে ২৫ জুলাই ১৯১২ সালে ঢাকার নর্থব্রুক হলে একটি সভা আহ্বান করা হয়। উক্ত সভায় পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের তৎকালীন গভর্নর লর্ড কারমাইকেল প্রস্তাব সমর্থন করে ২০০০ টাকা মঞ্জুর করেন। (নাজিমুদ্দিন : ৫) এরপর ঢাকার পুরাতন সেক্রেটারিয়াট বিল্ডিং এ "ঢাকা জাদুঘর" প্রতিষ্ঠা করে ১৯১৩ সালের ৭ আগস্ট উদ্বোধন করা হয়। হাকীম হাবীবুর রহমান জাদুঘর প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯১৫ সালে পুরাতন সেক্রেটারিয়াট বিল্ডিং থেকে ঢাকার নিমতলীর বারদুয়ারী ভবনে "ঢাকা জাদুঘর" স্থানান্তরের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ সময় ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, শ্রী নলিনীকান্ত ভট্টশালী, হাকীম হাবীবুর রহমান, মিস্টার স্টেপলটন এবং মিস্টার রাঙ্কিনসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ব্রিটিশ গভর্নর কাছে আবেদন করে। তাদের আবেদন গৃহীত হলে ১৯১৫ সালে "ঢাকা জাদুঘর" নিমতলীর বারদুয়ারী ভবনে স্থানান্তর করা হয়।

এভাবেই নানান ঘটনা ও পরিস্থিতির মধ্যে জনাব হাবীবুর রহমানের জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। তিনি যুগপৎ ভাবে শিক্ষা আন্দোলন ও সংস্কার, আর্ত-মানবতার সেবা, বুদ্ধিভিত্তিক সাংবাদিকতা এবং উর্দু ও বাংলা সাহিত্যে রচনার মাধ্যমে সামনের দিনগুলোর এগিয়ে যেতে থাকেন। জীবনের আরো পাঁচটি বছর অতিবাহিত হওয়ার পরে ১৯২০ সালে যখন একদিকে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন এবং অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ভারতীয় উপমহাদেশকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবান্বিত করতে লাগল, তখনো তিনি নীরব থাকেননি। নিজের সর্বোচ্চ দিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। এ সময় তিনি গান্ধীর প্রস্তাব অনুযায়ী ব্রিটিশ প্রদত্ত স্কুল কলেজ ও শিক্ষা-দীক্ষা বর্জনের বিরুদ্ধাচারণ করেন। তিনি "মুসলমান শিক্ষা রক্ষা কমিটি" নামক একটি কমিটি গঠন করেন এবং অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে ভারতীয় আলেমদের অভিমত বিষয়ক ৪৪ পৃষ্ঠার সংবলিত একটি উর্দু পুস্তিকা প্রকাশ করে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষন করার চেষ্টা করেন এবং একই সাথে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন যেন তারা শিক্ষা-দীক্ষা পরিত্যাগ না করে।

১৯২১ সালে তিনি শিক্ষা ও চিকিৎসা উভয়টি নিয়ে আরো জোরালোভাবে কাজ শুরু করেন। তিনি সামগ্রিকভাবে এই জাতিকে একটি শিক্ষিত জাতি পরিণত করার লক্ষ্যে এখানে একটি উন্নতমানের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে জোরালো ভূমিকা পালন করেন। তাঁর এবং অন্যান্যদের প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। এমনকি তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি তার সারাজীবনে সঞ্চিত প্রায় ৩০০০ এর অধিক বই এবং ২২১ অমূল্য পাণ্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে দান করেছেন। অন্যদিকে ১৯২১ সালেই বাংলার সরকার চিকিৎসার উন্নয়নে একটি পরিকল্পনা কমিটি গঠন করে। হাকীম হাবীবুর রহমান ছিলেন এই কমিটির একজন সদস্য। এই কমিটি পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রায় সকল ইউনানী শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করে এবং সরকারের নিকট কলকাতায় ও ঢাকায় দুটি ইউনানী মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। কিন্তু সরকার তাদের সুপারিশ গ্রহণ না করলেও তিনি নিরাশ না হয়ে, ১৯৩০ সালে ঢাকায় নিজ উদ্যোগে "তিব্বিয়া হাবীবিয়া কলেজ" নামে বাংলা ও আসামের প্রথম মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

বৈচিত্র্যময় জীবনের অধিকারী হাকীম হাবীবুর রহমান জীবনের কখনো কর্মহীন-শ্রমহীন থাকেননি। তিনি ১৯২৩ সালে আবারো সাংবাদিকতার প্রতি মনোনিবেশ করেন। এ সময় তিনি মুহাম্মদ আদিল এর সহযোগিতায় "জাদু" নামে আরও একটি মাসিক উর্দু পত্রিকা বের করেন। এটি হাকীম হাবীবুর রহমান এবং খাজা মুহাম্মদ আদিলের যুগ্ম-সম্পাদনায় ঢাকার দিলকুশা থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ১৯৩০ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। এদিকে ১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ঢাকাসহ ভারতের বিভিন্ন জায়গায়প্রায় ৮৮ টি দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল যেখানে প্রায় চার শতাধিক লোক মারা গিয়েছিল। ১৯২৬ সালে ঢাকায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সংঘটিত হলে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় লোকদের নিয়ে শান্তি কমিটি গঠন করেছিলেন। হাকীম হাবীবুর রহমান এই কমিটিরও একজন সদস্য হিসেবে এ সময় দেশের দাঙ্গা থামাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। (রহিম, ১৯৮৬ : ৪৬০)

১৯৩০ সালে একদিকে 'জাদু' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায় এবং অন্যদিকে হাকীম হাবীবুর রহমান ঢাকায় "তিব্বিয়া হাবীবিয়া কলেজ" নামে বাংলা ও আসাম এর প্রথম ইউনানী মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার পর তিনি কলেজ সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে খুব ব্যস্ত হয়ে পরেন। তিনি এ সময় নানাবিধ কাজ যেমন সাহিত্য সেবা, চিকিৎসা সেবা, রাজনীতি ইত্যাদির মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণে সেবা করে গেছেন। দেশ ও জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য এবং আর্ত-মানবতার সেবায় এভাবে আরো ৬টি বছর কেটে যায়। ১৯৩৬ তিনি আবারও রাজনীতি ও চিকিৎসা সেবার দিকে

গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। ১৯৩৬ সালে একদিন টাঙ্গাইলের জামে মসজিদে সেখানকার নেতৃস্থানীয় লোকজন একত্র হয়ে "টাঙ্গাইল মহাকুমা মুসলিম লীগ" গঠন করেন। উক্ত কমিটিতে মাসুদ আলী খান পন্নী এবং হাকীম হাবীবুর রহমান যথাক্রমে সভাপতি এবং সেক্রেটারি পদে নির্বাচিত হন। (হাকিম, ২০০১ : ৭৬)

১৯৩৭ সালে হাকীম সাহেব টাঙ্গাইলে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। এ সময় তিনি খুব অল্প দিনের মধ্যে টাঙ্গাইলে অনেক জনপ্রিয় একজন চিকিৎসক হয়ে ওঠেন। তিনি দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এ সম্পর্কে এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো যার মাধ্যমে ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রে তার হাতযশ, পারদর্শিতা এবং সুখ্যাতি সম্পর্কে আমাদের কাছেই স্পষ্ট ধারণা আসবে। এটি ১৯৩৮/১৯৩৯ সালের ঘটনা। যখন ঢাকা বিভাগের কমিশনার মি. লারকিনের কিডনিতে পাথর হয়েছিল। এ সময় তিনি ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার তাকে বিলাতে গিয়ে অপারেশন করাতে বলে। তখন মি. লারকিন হাকীম হাবীবুর রহমানের খ্যাতির কথা শুনে তাঁর কাছে আসে। হাকীম সাহেব এ সময় তাকে সান্ত্বনা দিয়ে ঔষধ প্রদান করেন। মাত্র তিন বা চার দিন ঔষধ খাওয়ার পরেই তার কিডনির পাথর টুকরো টুকরো হয়ে প্রস্রাবের সাথে বের হয়ে যায়। (হাকিম, ২০০৪ : ১১) এভাবেই হাকীম হাবীবুর রহমানের সুনাম এবং সুখ্যাতি দিনেদিনে বেড়েই চলল। অবশেষে তাঁর মানবসেবা, চিকিৎসা বিজ্ঞানে অবদান, উপমহাদেশে ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রসার ইত্যাদি কারণে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৯ সালে তাকে শেফাউল মূলক উপাধিতে ভূষিত করে।

১৯৪০ সালে হাকীম হাবীবুর রহমান আঞ্জুমানে আতিব্বায়ে বাঙ্গাল ও আসাম অর্থাৎ ইউনানী মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বাংলা ও আসাম প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির মাধ্যমে তিনি পূর্ববাংলার হেকিম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। এ সময় তিনি বাংলায় স্টেট ফ্যাকাল্টি অব ইউনানী মেডিসিনও গঠিত করেন। কর্মব্যস্ত জীবনের চূড়ান্ত পর্যায়ে হাকীম হাবীবুর রহমান ঢাকার মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার হিসেবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত (১৯৪২-১৯৪৭) ঢাকা পৌরসভার বিভিন্ন কাজ নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করেছেন। পৌর জনগোষ্ঠীর জনসেবা এবং জনকল্যাণমূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তৎকালীন আমলে ঢাকা পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত স্কুল এর নামকরণ করা হয় "শেফাউল মূলক ফ্রি প্রাইমারি স্কুল"। (নওশাহী, ১৯৯৫ : ১৫) এছাড়াও তার কল্যাণমূলক কাজের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তৎকালীন আমলে ঢাকার চকমোগলটুলী থেকে ছোটকাটরা হয়ে সোয়ারীঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত সড়কের নামকরণ করা হয়েছিল "হাকীম হাবীবুর রহমান রোড"।

মৃত্যুবরণ

হাকীম হাবীবুর রহমান সত্যিকার অর্থেই একজন বিদ্বান ব্যক্তি, বিখ্যাত চিকিৎসক, বিচক্ষণ রাজনীতিক এবং বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিক হিসেবে দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য কাজ করেছেন। সুদীর্ঘ ৪৩ বছরের (১৯০৪-১৯৪৭) কর্মব্যস্ত জীবনে অতিবাহিত করার পর এই বর্ষীয়ান এবং খুরধার ব্যক্তি ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ মোতাবেক ১৩৬৬ হিজরীর রবিউল আউওয়াল মাসের পহেলা তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

উর্দু সাহিত্যে হাকীম হাবীবুর রহমান এর অনবদ্য অবদান

সাহিত্যের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত এবং এর গতিধারা যুগ বিবর্তনের সাথে পরিবর্তনীয়। উর্দু পদ্য সাহিত্যের নানান রূপ বৈচিত্র্যের মাঝে হাকীম হাবীবুর রহমান নাত, গজল ও কাসিদা রচনায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। অন্যদিকে উর্দু গদ্য সাহিত্যের নানাবিধ প্রকার-প্রভেদের মাঝে হাকীম

সাহেব প্রবন্ধ, নাটক, জীবনী সাহিত্য, ইতিহাত রচনা সাংবাদিকতা, অনুবাদ, সাহিত্য সংকলন ইত্যাদি রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন।

উর্দু কবি

হাকীম হাবীবুর রহমানের কবিত্বশক্তি জন্মলব্ধ এবং স্বতঃস্ফূর্ত। তিনি বহুমাত্রিক, বিচিত্র ভঙ্গিমা এবং সৃষ্টিশীল প্রয়োগের মাধ্যমে জীবনযাত্রায় সঞ্চিত বিভিন্ন বিষয়াদি বৈচিত্রময় শিল্প শৈলীর মাধ্যমে উর্দু কবিতার প্রতিটি ছন্দে ছন্দে তুলে ধরেছেন। তিনি একজন স্বভাব কবি। বাল্যকাল থেকেই তিনি একজন ছন্দ-প্রেমী, সৃষ্টিশীল মানুষ। "সালাসা গাসসালাহ" গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, মাত্র ১০ বছর বয়সেই তিনি কবিতা রচনা শুরু করেন। (জাফর : ২১) তার কাব্যনাম ছিল আহসান এবং গুরু মুনশী আব্দুর রহিম। তিনি তার গুরুর কাছ থেকে কবিতা শুধরিয়ে নিতেন। খাজা নাযিমুদ্দীন (১৮৯৪- ১৯৬৪) তাঁর কাব্যচর্চা সম্পর্কে বলেছেন - "কাব্য চর্চার প্রতি হাকীম মরহুমের বেশ ঝোঁক ছিল"। ১৯০১ সালে যখন ঢাকার নবাব স্যার আহসানুল্লাহ (১৮৬৪-১৯০১) মৃত্যুবরণ করেন তখন তাঁর মৃত্যুতে হাকীম হাবীবুর রহমান মাত্র ২০ বছর বয়সে উর্দুতে একটি মর্সিয়া রচনা করেছিলেন।

হাকীম হাবীবুর রহমানের একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর কাব্য গ্রন্থের নাম : ***নাত হি নাত***। গ্রন্থটি ১৯০০ সালে কানপুর থেকে প্রকাশিত হয়। এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪। কাব্যটির নাম "নাত হি নাত" হলেও এতে নাত ছাড়াও কসিদা ও গজল সন্নিবেশিত রয়েছে। এ গ্রন্থ সম্পর্কে কবি হাকীম হাবীবুর রহমান বলেছেন – "আজ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে এখানকার স্মরণীয় রচনাবালি, দেশপ্রেম এ গ্রন্থটির মাধ্যমে জানা যাবে। এতে ঢাকার কবিদের এমন কিছু কবিতার নমুনা রয়েছে যা এই গ্রন্থটি ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়"।

কবিতা রচনার অদম্য ইচ্ছায় আবেশিত হওয়া সত্ত্বেও নানান কর্ম ব্যস্ততায় জর্জরিত হাকীম হাবীবুর রহমান খুব বেশি দিন কাব্য রচনা চালিয়ে যেতে পারেননি। তথাপি তিনি উর্দু কবিতার প্রচার এবং প্রসারে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কাজ করে গেছেন। উর্দু কবিতাকে এই পূর্ববঙ্গে জনপ্রিয় করার মানসে তিনি প্রায়শ এখানে কবি সমাবেশ বা মুশায়ারার আয়োজন করতেন। তার প্রচেষ্টায় ১৯২৮ সালে ৪ অক্টোবর উর্দু কবি মির্যা আবু জাফর কাশফীর বাসায় "মুশায়ার" অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মুশায়ারা পরিচালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্সি ও উর্দু বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান ফিদা আলী খান। উক্ত মুশায়ারায় উনারা দুইজন ছাড়াও খাজা বেদার বখত বেদার, ড. আন্দালিব শাদানী, সৈয়দ শরফুদ্দীন শরফ আলী হোসাইনী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও হাকীম হাবীবুর রহমানের পুত্রদ্বয় জনাব ইরতিযাউর রহমান ও জনাব হুসামুর রহমানের এর বক্তব্য অনুযায়ী ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রতি মাসে তাদের বাসায় তাদের বাবার নেতৃত্বে মুশায়ারা অনুষ্ঠিত হতো। (ইসরাত, ১৯৬৮ : ২১৮) খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব একথার সত্যায়ন করে বলেন, "জাদু" পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে তিনি মুশায়ারার ব্যবস্থা করেন। প্রত্যেক মাসেই তার ঘরে মুশায়ারা অনুষ্ঠিত হতো"।

উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা আরো বেশি বেগবান করার অভিপ্রায় নিয়ে তিনি "আঞ্জুমান এ মাশরিকে বাঙ্গাল ওয়া আসাম" নামে একটি সাহিত্য সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও ধারণা করা হয় যে, তিনি ১৯০৬ সালে "আঞ্জুমান এ উর্দু" ও প্রতিষ্ঠা করেন।

জীবনচরিতকার

অনুপম সৌন্দর্য কিংবা অসাধারণ জ্ঞানগরিমা, সৃষ্টিশীল উদ্ভাবন কিংবা বিশ্ব-সভ্যতায় অনবদ্য অবদানে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবান্বিত হয়ে কারো কারো জীবন নিয়ে রচিত হয় জীবনী সাহিত্য। হাকীম

হাবীবুর রহমান একজন নামকরা জীবনচরিতকার না হলেও তিনি সফলভাবেই গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস এর জীবনকথা আলোচনা করেছেন। তিনি ২০ শতকে পূর্ববাংলায় উর্দু জীবনী সাহিত্যের সফল সূচনা করেন।

হাকীম হাবীবুর রহমান রচিত একটি মাত্র জীবনচরিতমূলক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রন্থটির নাম ***হায়াত-এ-সুকরাত***। গ্রন্থটি ১৯০৪ সালে আগ্রার কাদেরী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮। বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিসের জীবন এবং জীবন-দর্শন সম্পর্কে এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।

সম্ভবত সক্রেটিসের জীবনী, জ্ঞান ও দর্শন এর বিচিত্রতা, বহুমাত্রিকতা এবং অর্থবহতা হাকীম সাহেবকে খুব প্রভাবান্বিত করেছিল। তাই তিনি এ গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটিতে সক্রেটিসের জীবনকথার চেয়ে তার জীবনাদর্শের উপরই বেশি আলোকপাত করা হয়েছে। এ গ্রন্থে সক্রেটিসের চারিত্রিক গুণাবলির সাথে সাথে তার ধর্মীয় মতবাদও উল্লেখ করা হয়েছে। সক্রেটিসের বিখ্যাত ১৬টি অমর বাণী স্মৃতিচারণের মাধ্যমে গ্রন্থটির পরিসমাপ্তি হয়েছে। যেমন ১. মানুষের সবচেয়ে বড় শ্রেষ্ঠত্ব হল জ্ঞান আর সবচেয়ে বড় জ্ঞান হলো নিজেকে জানা। ২. জ্ঞানীকে ততক্ষণ জ্ঞানী বলা যাবে না যতক্ষণ সে তার নিজের প্রবৃত্তিকে দমন না করবে। ৩. তন্দ্রা হলো ছোট মৃত্যু, ঘুম হলো দ্বিতীয় মৃত্যু, কাজেই বেশি ঘুমানো মৃত্যুকে কাছে ডাকা এবং তাকে আলিঙ্গন করারই নামান্তর ইত্যাদি। এ গ্রন্থের মুখবন্ধে হাকীম হাবীবুর রহমান বলেন – "জীবন চরিত্র অধ্যায়ন করে উপদেশ, সৎ গুণাবলি আনন্দ মোটকথা সব কিছু অর্জন করা যায়। কিন্তু তা কখন? যখন এর নায়ক ঐসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয় এবং লেখক ও সে সম্পর্কে মন্তব্য পেশ করতে সক্ষম"।

উর্দু নাট্য সাহিত্য

সংস্কৃত আলংকারিকগণের ভাষ্য অনুযায়ী কাব্য দুই প্রকার – দৃশ্য কাব্য ও শ্রব্য কাব্য। নাটক প্রধানত দৃশ্য কাব্য এবং এটি সকল প্রকার কাব্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ। একজন যথার্থ নাট্যকার প্রবাহমান মানবজীবনের প্রতি "ছবি নাটকের মাধ্যমে আমাদের সম্মুখে ফুটিয়ে তোলেন এবং একই সাথে তিনি নাট্যোল্লিখিত কুশীলবগণের অভিনয় নৈপুণ্যের মাধ্যমে নাটকের কঙ্কালদেহে প্রাণসঞ্চারে সচেষ্ট হন। হাকীম হাবীবুর রহমান এমনই একজন নাট্যকার হওয়ার অভিপ্রায় নিয় উর্দু নাটক রচনায় এগিয়ে আসেন। "উর্দু ড্রামা কা ইরতিকা" গ্রন্থের লেখক ইশরাত রহমানী এবং ত্রৈমাসিক "উর্দু" থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী হাকীম হাবীবুর রহমানের দু টি নাটকের সন্ধান পাওয়া যায়।

১. গরীব হিন্দুস্তানী : খেলাফত আন্দোলন (১৯১৯-১৯২৪) যা ভারতীয় মুসলিম আন্দোলন নামেও পরিচিত, এটি মূলত একটি ধর্মীয় পুনর্জাগরণের আন্দোলন। ১৯১৯ সালে হাকীম হাবীবুর রহমান এ আন্দোলনে যোগ দেন। এ সময় তিনি রাজনৈতিক চেতনা-সমৃদ্ধ এই নাটকটি রচনা এবং মঞ্চস্থ করেন। নাটকটি হাকীম হাবীবুর রহমানের প্রথম প্রয়াস ছিল। তাই এতে একটি আদর্শ নাটকের বৈশিষ্ট্য যেমন সূচনা, বিকাশ ও পরিণতি এবং স্থান-কাল-ঘটনার ঐক্যের কিছুটা অপ্রতুলতা ছিল। (ত্রৈমাসিক উর্দু, ১৯৮৮ : ২১) এ কারণে নাটকটি বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। তথাপি হাকীম হাবীবুর রহমানের প্রথম প্রয়াস হিসেবে তিনি এই নাটকের কারণে যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছেন।

২. বেদারী: হাকীম হাবীবুর রহমান "বেদারী" নামে আরো একটি নাটক রচনা করেছিলেন। "উর্দু ড্রামা কা ইরতিকা" গ্রন্থের লেখক ইশরাত রহমানী এর তথ্যনুযায়ী, নাটকটি ১৯২২ এবং ১৯২৪ সালে ঢাকার মঞ্চস্থ হয়েছিল। (ইস্রাফিল, ২০১৬ : ৯৯) বর্তমানে নাটকটির পাণ্ডুলিপি দুষ্প্রাপ্য।

উর্দু সাংবাদিকতা

ভারতীয় উপমহাদেশে উর্দু সাংবাদিকতার ইতিহাস সুপ্রাচীন ও বিশ্লেষণধর্মী। এই উপমহাদেশে মুসলিম জাগরণের উর্দু সাংবাদিকতার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। উনিশ ও বিশ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম জাগরণের কাল। এই সময়ে মুসলিম জাগরণকে ত্বরান্বিত ও বেগবান করার ইচ্ছায় হাকীম হাবীবুর রহমান উর্দু সাংবাদিকতা শুরু করেন। তিনিই সর্বপ্রথম পূর্ববঙ্গ ও আসামে উর্দু সাংবাদিকতা সূচনা করেন। তাই তাকে এই অঞ্চলের উর্দু সাংবাদিকতার পথিকৃৎ বলা হয়। তিনি মোট দুইটি সংবাদপত্রের সম্পাদনা করেছেন।

১. আল-মাশরিক : হাকীম হাবীবুর রহমান সম্পাদিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রথম মাসিক উর্দু পত্রিকার নাম আল-মাশরিক। পত্রিকাটি ১৯০৬ সালের অক্টোবর মাসে ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩০-৩২ এবং সাইজ ৮ ১/৪"×৭" । এই পত্রিকায় প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫)। এটি প্রথমে কলকাতার রেদুয়ানী প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে ঢাকার দারুল ইশাআত আহসানুল মাতাব থেকে প্রকাশিত হতো। পরে এটি ঢাকাতেই মুদ্রিত হতে থাকে। পত্রিকাটি প্রথমত মাসিক পত্রিকা আকারে বের হলেও পরবর্তীকালে এটি সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে বের হতে থাকে। (হাবিবুর, ১৯৮৬ : ০১)

হাকীম হাবীবুর রহমান এর আল-মাশরিক পত্রিকাটি তদানীন্তন পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের মুসলমানদের একমাত্র জাতীয় পত্রিকার স্বীকৃতি পেয়েছিল। মুসলমানদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে পত্রিকাটির ভূমিকা ছিল আপোষহীন। এজন্য এ পত্রিকাটি মুসলমানদের কাছে খুব জনপ্রিয় ছিল। এ পত্রিকার মলাটে লেখা থাকত "নতুন পূর্ববাংলা ও আসামে মুসলমানদের একমাত্র ইস্যু"। পত্রিকাটিতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলি ছাড়াও জ্ঞানমূলক, ইসলামি ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সন্নিবেশিত থাকতো বিধায় এতে উর্দু ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রসার বহুগুণে ত্বরান্বিত হয়েছিল। হাকীম হাবীবুর রহমান ছাড়াও শরফুদ্দীন শরফ, সৈয়দ আবুল ফাত্তাহ, সৈয়দ মাহমুদ আযাদ, মুহাম্মদ কাসেম হাশির, মৌলভী নাজমুদ্দীন, খাজা মমতাজ উদ্দীন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ কবিতা ও প্রবন্ধ লিখতেন।

২. জাদু : হাকিম হাবিবুর রহমান সম্পাদিত ২য় উর্দু পত্রিকার নাম "জাদু"। পত্রিকাটি ১৯২৩ সালে খাজা মোহাম্মদ আদিল এর সহযোগিতায় বের হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩৫-৪০ এবং সাইজ (১"×৭")। পত্রিকাটির ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে বন্ধ হয়ে যায়। এটি হাকিম হাবিবুর রহমান এবং খাজা মোহাম্মদ আজিজ এর যুগ্ন সম্পাদনায় ঢাকার দিলকুশা থেকে প্রকাশিত হতো। সাধারণত পত্রিকাটিতে লেখা থাকত খাজা মুহাম্মদ আদিলের সম্পাদনায় প্রকাশিত। তবে কোনো কোনো সংখ্যায় উভয়ের নাম সম্পাদক পাওয়া যায়। এই পত্রিকার লেখকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হাকীম হাবীবুর রহমান, খাজা মোহাম্মদ আদিল, হাফিজ নযীর আহমদ, মৌলভী বদরুজ্জামান, খাজা শিহাবুদ্দীন, রেযা আলী ওয়াহশাত, খালেদ বাঙ্গালী প্রমুখ।

উর্দু ভাষায় প্রবন্ধ রচনা

ঐতিহাসিকের গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করা হাকীম হাবীবুর রহমান ছোটবেলা থেকেই ইতিহাসে প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন। (আব্দুল্লাহ : মুখবন্ধ) তিনি তার জীবদ্দশায় ঢাকার ইতিহাস সম্পর্কে তিনটি প্রবন্ধ লিখেছেন। সেগুলো হচ্ছে:

১. ঢাকে কী তারিখে আযমত: হাকীম হাবীবুর রহমান এ প্রবন্ধে ইসলাম খান থেকে শুরু করে ইংরেজ আমল পর্যন্ত ঢাকার প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব এবং এর পট পরিবর্তনের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। একই সাথে এটা ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন যে, মোঘল আমল থেকে ইংরেজ আমল পর্যন্ত ঢাকা কিভাবে দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. কিলআ-এ-ঢাকা: এই প্রবন্ধের লেখক ঢাকার লালবাগ কেল্লার প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য তুলে ধরে প্রচলিত কিছু ভুল তথ্যকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

৩. বেনায়ে ঢাকা কে মুতাআল্লাক চান্দ তারিখী ফের গুজাস্ত: এ প্রবন্ধে লেখক রাজধানী ঢাকার নামকরণ কিছু সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ করেছেন। যেমন বাংলার সুবাদার ইসলাম খানের এ বিরাণভূমি খুব পছন্দ হয়। তিনি এটি আবাদ করতে ইচ্ছা পোষণ করলেন। তাই শহরের সীমানা নির্দিষ্ট করার জন্য পতাকা হাতে তিনজন কর্মচারীকে তিন দিকে (পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর) পাঠিয়ে দেন। আর ঢাকীদের বললেন ঢাক বাজাতে। ঢাকের শব্দ যে যে স্থান পর্যন্ত পৌঁছালো সেখানে কর্মচারীরা আদেশ অনুসারে পতাকা পুঁতে দিল। সেই ঢাক থেকে ঢাকা নামের উৎপত্তি ইত্যাদি।

ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ ছাড়াও হাকীম হাকীমম হাবীবুর রহমান অন্যান্য বিষয়েও উর্দু ভাষায় বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধও রচনা করেছেন। সেগুলো হলো:

১. বাংগালীয়্যু কি উর্দু শায়েরী: এই প্রবন্ধে লেখক হাবীবুর রহমান পূর্ববঙ্গ ও ঢাকায় বসবাসরত উর্দু কবি সাহিত্যিকদের জীবন এবং তাদের কাব্য চর্চা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তৎকালীন আমলের উর্দু কবি সাহিত্যিকদের লেখার মান, গতিধারা, শব্দ চয়ন, বাগধারার ব্যবহার, বাক্য বিন্যাস প্রক্রিয়া ইত্যাদি অনুধাবনের উৎস হিসেবে এই প্রবন্ধটি বেশ গুরুত্ববহ।

২. বাংগাল মেঁ এলমে হাদীস: সৈয়দ সুলাইমান নাদবীর অনুরোধে হাকিম হাবিবুর রহমান এই প্রবন্ধটি লেখেন। এই প্রবন্ধে লেখক যুগ যুগ ধরে এই বঙ্গদেশে হাদিসের যে চর্চা হয়েছিল, তার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন।

৩. শামছুল বায়ান: এটি মির্যা জান তাপিশ রচিত গ্রন্থ "শামছুল বায়ান"-এর উপর একটি পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধ। এতে লেখক বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বপ্রথম বীরনায়ক নবাব শামছুদ্দৌলা এবং তার সহচর মির্যা জান তাপিশ কলকাতায় কারাবরণ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এই প্রবন্ধে লেখক বলেছেন, "তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় আসেন এবং এখানে কিছুদিন ফিরিংগী জেলখানায় অতিবাহিত করেন। তার কারাবরণের কারণ জানা যায়নি। তবে এতটুকু অনুমান করা হয় যে, রাজনৈতিক কারণে তাকে কারাবরণ করতে হয়েছিল। সম্ভবত নবাব শামসুদ্দৌলাহার সহচরী ছিল তার কারাবরণের কারণ"।

৪. হাজী শাহবায : এই প্রবন্ধটি ১৯০৭ সালের এপ্রিল মাসে মআল মাশরিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে হাকীম হাবীবুর রহমান হাজী শাহবাযে ঢাকায় আগমন থেকে শুরু করে তার মৃত্যু পর্যন্ত বিষয়াদি আলোকপাত করেছেন। হিজরি ১০০৩ সালে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে আরাকান বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য হাজী শাহবায ঢাকায় আসেন। পরবর্তীকালে তিনি ঢাকাতেই থেকে যান এবং এখানেই ইন্তেকাল করেন। রমনা রেসকোর্স ময়দানের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে হাজী শাহবাযের মসজিদের পাশেই তাকে দাফন করা হয়।

৫. ইসলাহে যাবানে উর্দু : এ প্রবন্ধটি সম্ভবত ১৯২৩ সালে ওই সময় লেখা হয় যখন চারদিকে উর্দুভাষা সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ঐ সময় (১৯২৩ সালে) কিছু সাহিত্যিক ও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ উর্দু ভাষা সরলীকরণের নামে এ ভাষায় ব্যবহৃত কম-উচ্চারিত অথবা প্রায় সমুচ্চারিত বর্ণগুলোকে ভাষার বর্ণমালা থেকে বাদ দেয়ার আন্দোলন শুরু। হাকীম হাবীবুর রহমান এই প্রবন্ধে সেইসব সাহিত্যিক ও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গদের কথার জবাব দিয়েছেন। এবং বলেছেন "পৃথিবীর প্রত্যেকটি উন্নত মানের ভাষায় এমন কতগুলো চিহ্ন রয়েছে যা সেই জাতির উৎসমূলের ইঙ্গিত বহন করে। জাতির ইতিহাস ও তার বৈশিষ্ট্য শব্দ গঠন প্রণালীর মধ্যে নিহিত থাকে"।

সার্থক উর্দু অনুবাদক

স্বরচিত কবিতা, প্রবন্ধ ও নাটক ছাড়াও হাকীম হাবীবুর রহমান একজন সার্থক অনুবাদক হিসেবে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছেন। তার অনুবাদমূলক সাহিত্যকর্মের সংখ্যা মোট ৩টি।

১. রুমুজুল আখলাক: মাশরিকী বাংগাল মে উর্দু গ্রন্থের লেখক ইকবাল আযীম বলেন, হাকীম হাবীবুর রহমান জনাব আব্দুল করিম খাকীর ফারসি রচনা রুমুজুল আখলাক এর উর্দু অনুবাদ করেছেন। যদিও ড. আরিফ নওশাহী এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষন করে বলেন যে, আব্দুল করিম খাকীর নিজেই এ গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ করেছিলেন।

২. কুচ লামহে কে লিয়ে: এটি হাকীম হাবীবুর রহমানের ফারসি গল্পের উর্দু অনুবাদ। এ গল্পটি এতটা মনোমুগ্ধকর ছিল যে, ১৯৬৭ সালে এ গল্প অবলম্বনে ঢাকায় 'চেনা-অচেনা' নামক একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছিল। এছাড়াও ১৯৯৫ সালে কলকাতায় 'আশ্রিতা' নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছিল।

৩. মোকাদ্দামাত এ দিওয়ানী কা দাস্তুরুল আমল : এটি একটি আইন গ্রন্থ। ৫৮৭ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি কলকাতার ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এটি কলকাতা সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি উইলিয়াম মিকফারসন এর গ্রন্থ The Prosedure of the Civil Counts নামক ইংরেজি গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ। হাকীম হাবীবুর রহমানের পূর্বে মুনশী নাছির উদ্দিন আহমেদও এ গ্রন্থের অনুবাদ করেছিল কিন্তু হাকীম সাহেবের অনুবাদটি বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে। এর অনুবাদের কারণে তিনি বঙ্গদেশে দারুণভাবে প্রশংসিত হন। মূল গ্রন্থের প্রথম ভলিয়মে মোট ১২ টি অধ্যায় আছে। প্রথম অংশে আছে ৯ টি অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অংশে আছে ৩ টি অধ্যায়।

সাহিত্য সংকলক

সাহিত্য সংকলনেও হাকীম হাবীবুর রহমান অবদান রেখেছেন। তিনি সুদীর্ঘ ৪০ বছর যাবৎ অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে পূর্ববাংলা, পশ্চিম বাংলা এবং আসামের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উর্দু, ফারসি ও আরবি গ্রন্থগুলো সংগ্রহ করেন এবং "সালাসা গাসসালাহ" নামে একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থটি তিনটি অংশে বিভক্ত। ১ম অংশে ২০৪ টি গ্রন্থের বিবরণ রয়েছে। ২য় অংশে ১৮১ টি ফারসি গ্রন্থ এবং ৩য় অংশে ৩৭ টি আরবি গ্রন্থে বর্ণনা রয়েছে। এই গ্রন্থে তিনি ঐ সকল লেখকদের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাদের সাহিত্যকর্মের উপর আলোকপাত করেছেন।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও হাকিম হাবিবুর রহমান আরো কিছু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন।

১. আল ফারেক: "আল ফারেক" হাকীম হাবীবুর রহমানের দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ। এটি ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয়। ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর লিখিত গ্রন্থটি তিনি মাত্র ২৪ বছর বয়সে এ গ্রন্থটি রচনা করেন। ৮০ পৃষ্ঠায় সংবলিত এই গ্রন্থটি তিনি তৎকালীন ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫) এর নামে উৎসর্গ করেন। এই বইটি পড়ে হাকীম আজমল খাঁ খুব পছন্দ করেন এবং হাকীম হাবীবুর রহমানকে উৎসাহিত করার জন্য ৫০ টি কপি কিনে নেন। এই গ্রন্থের প্রথমে তিনি ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন। অতঃপর ১ম ও ২য় অধ্যায়ে যথাক্রমে ১০৯ এবং ১০১ টি জোড়া পারিভাষিক শব্দের পার্থক্য তুলে ধরেন।

২. আসুদেগানে ঢাকা: এই গ্রন্থটি ১৯৪৬ সালে ঢাকার এমদাদিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়। ১৫৮ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত এ গ্রন্থে ঐতিহাসিক শহর ঢাকায় বিভিন্ন সময়ে আগত অসংখ্য ওলি-আউলিয়াদের মাযারগুলো সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এই গ্রন্থে প্রায় দুইশত মাযার ও কবর সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করা হয়েছে। এই গ্রন্থটি রচনা করতে তাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে তার বন্ধু সাইয়্যেদ বাকের আলী খান, সাইয়্যেদ শাহ আবদুন নাইম ও মাস্টার দীন মুহাম্মদ খান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছিল। পাঠকের সুবিধার্থে হাকীম হাবীবুর রহমান ঢাকাকে মোট সাতটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করে, প্রত্যেক ওয়ার্ডের আলাদা আলাদা ভৌগোলিক বিবরণ, জনসংখ্যা ও তাদের ভাষা এবং কবরস্থানের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন।

৩. ঢাকা পচাস বরস পহলে: এট একটি কথিকা সিরিজ। ১৯৪৫ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিও ঢাকা কেন্দ্র থেকে উর্দু ভাষায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের সংকলন। ১৮৪ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে বর্তমান সময় থেকে প্রায় একশত বছর পূর্বের ঢাকার সমকালীন সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং তথ্যসমৃদ্ধ ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ঐতিহাসিক দিক বিবেচনায় এই গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলো ছাড়াও হাকীম হাবীবুর রহমানের আরো কিছু গ্রন্থ ও কথিকার সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন তাযকিরাতুল ফুযালা, মাসাজিদে ঢাকা ও শুয়ারায়ে ঢাকা, কুচ পুরানী বাতেঁ ও ঢাকা কী তারিখী ইমারত ইত্যাদি।

ক্ষণজন্মা এই বিচক্ষণ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব কর্মজীবনের শুরু থেকেই চিকিৎসা পেশার পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে কাজ করেন। চিকিৎসা, রাজনীতি এবং সাংবাদিকতার ফাঁকে ফাঁকে তিনি উর্দু সাহিত্যের প্রচার – প্রসার ও সাহিত্যকর্ম রচনায় নিজের সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। তার জীবনাবসান হয়ত তার কর্মকে অস্তমিত করেছে তথাপিও দেশ ও জাতির কল্যাণে তিনি যেসব কাজ ও সাহিত্য রচনা করে গেছেন তা জাতির ইতিহাসে এবং সাহিত্যাকাশে আজও জাজ্বল্যমান ও উদ্ভাসিত হয়ে আছে।

উল্লেখপঞ্জি

মোঃ ইস্রাফিল, ২০১৬ হাকিম হাবিব-উর-রহমান সমাজ সেবক ও সাহিত্য সাধক, শেফাউল মূলক হাকিম হাবিবুর রহমান ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

মোঃ আব্দুল্লাহ, ১৯৯১ ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ।

মোঃ আব্দুলাহ, ১৯৫৪, হাকীম হাবীবুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন।

ইকবাল আযীম, ১৯৮১ মাশরিকী বাঙ্গাল মে উর্দু, মাশরিক কো-অপারেটিভ পাবলিশার্স, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, ২০০৩ বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশের জাতীয় বিশ্বকোষ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

ইকবাল আযীম, ১৯৫৪ মাশরিকী বাঙ্গাল মেঁ উর্দু, মাশরিক কো-অপারেটিভ পাবলিশার্স, ঢাকা।

মাওলানা মুহিউদ্দিন, ১৯৬৯ পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

আরিফ নওশাহী (সম্পাদিত), ১৯৯৫ সালাসা গাসসালা, হাকীম হাবীবুর রহমান, উর্দু একাডেমী, লাহোর।

মোঃ আব্দুল্লাহ, ১৯৮১ হাকীম হাবীবুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

ওয়াফা রাশেদী, ১৯৫৫ বেঙ্গল মে উর্দু, ইফতেখার প্রেস, হায়দ্রাবাদ।

মোঃ ইস্রাফিল, ২০১৬ হাকিম হাবিব-উর-রহমান সমাজ সেবক ও সাহিত্য সাধক, শেফাউল মূলক হাকিম হাবিবুর রহমান, ফাউন্ডেশন, ঢাকা। প্রাগুক্ত।

মোঃ আব্দুল্লাহ, ১৯৯১ ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

মোহাম্মদ মুসলিম হাকীম (সম্পাদিত), ২০০১ মৃত্যুঞ্জয়ী হাকীম হাবীবুর রহমান, শেফাউল মূলক হাকীম হাবীবুর রহমান ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

মোঃ আব্দুল্লাহ, ১৯৯১ ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

মোঃ আব্দুল্লাহ, ১৯৯৬ রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

মৃত্যুঞ্জয়ী হাকিম হাবিবুর রহমান, ১৯৯৩ মুনতাসির মামুন স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী, অনন্যা পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

ঢাকা পচাস বরস পহলে, খাজা নাজিমুদ্দিন লিখিত ভূমিকা।

আব্দুর রহিম খন্দকার, ১৯৮৬ টাংগাইলের ইতিহাস, (তৃতীয় সংস্কার)।

মোহাম্মদ মুসলিম হাকীম (সম্পাদিত), ২০০১ মৃত্যুঞ্জয়ী হাকীম হাবীবুর রহমান, শেফাউল মূলক হাকীম হাবীবুর রহমান ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

ত্রৈমাসিক আল হাকিম, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৪।

আরিফ নওশাহী (সম্পাদিত), ১৯৯৫ সালাসা গাসসালা, হাকীম হাবীবুর রহমান, উর্দু একাডেমী, লাহোর।

ড. জাফর আহমেদ ভূঁইয়া, বাংলাদেশে উর্দু সাহিত্য, কামিয়াবি প্রকাশনী, ঢাকা।

ইসরাত রহমানী, উর্দু ড্রামা কা ইরতিকা, লাহোর, শায়খ গুলাম আলী এন্ড সন্স, ১৯৬৮, পৃঃ ২১৮

ত্রৈমাসিক উর্দু, প্রথম সংখ্যা, ১৯৮৮, পৃঃ ২১

ড. মোঃ ইস্রাফিল, হাকিম হাবিব-উর-রহমান সমাজ ও সাহিত্য সাধক, শেফাউল মূলক হাকিম হাবিবুর রহমান ফাউন্ডেশন, ২০১৬ ঢাকা, পৃঃ ৯৯

হাকীম হাবীবুর রহমান, ১৯৪৬ আসুদগানে ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, পৃঃ ০১